ঘাটশিলার স্মৃতি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের 'জুতা-আবিষ্কার' পদ্যটি যে-দেশে ছোটবেলাতেই পড়তে হয়, সে-দেশে সেমিনার ব্যাপারটা যে কী, তা হয়তো বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। পৃথিবীর সব সেমিনারেই, আমারও ধারণা ছিল, পদধূলিতত্ত্ব নিয়ে উনিশ পিপে নস্য সেবনান্তর সতের লক্ষ সম্মার্জনী হস্তে ধুলোই ওড়ানো হয় শুধু। সূর্য ঢেকে যায়। ঘাটশিলায় তাই পেন্সিল বা নোটবই নিয়ে যাইনি। কোনও প্রত্যাশা ছিল না।

ঘাটশিলায় 'ফোরাম ফর আর্ট অ্যান্ড রিসার্চ' (FAR) আয়োজিত তিনদিনের সেমিনারে যোগ দিয়ে, আমার তাই বলতে অত্যন্ত নিষ্পাপ লাগছে যে, আমার সেমিনার-ধারণা, নির্মূলভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। প্রেমে-পড়ার মতন ভুল ধারণা ভেঙে-পড়ারও কোনও বয়স নেই। এ-রকম অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন এতে কী মুক্তির আনন্দ! এরকম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পরাজয়ই জয় হয়ে দাঁড়ায়।

২৭, ২৮, ২৯ অক্টোবর, ১৯৯৪ এই সেমিনার চলে ঘাটশিলায় পার্বতী মুখার্জির 'মৌ-শিলা' নামে বাড়ির ঢাকা বারান্দায়। মাঝখানে লাঞ্চ-ব্রেক-এর এক ঘণ্টা বাদে

সেমিনার চলত অনর্গল— সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। লাঞ্চ বলতে ফুলডুংরির টিলার পাদদেশে একটি ঝোপড়ি-হোটেলে তিন কোর্সের লাপ্‌সি। সকালে মুড়ি-সিঙারা সহযোগে ভাঁড়ে চা-পানের সময়টুকুতেও আলোচনার জের চলত। রাত্রিবাস ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে— এর-ওর বাড়িতে— বিভূতি-ভবনে। মশারি বা লেপ-তোষক সবাই পায়নি। শিল্পী বাঁধন দাস সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন বহনযোগ্য তাঁবু। উনি মাঠে থাকতেন। উল্লেখযোগ্য যে, কমবেশি ৪০ জন বুদ্ধিব্রতীর এই দৈনিক ৪-প্রহর-ব্যাপী মন-কষাকষি ছিল একান্তভাবে তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ, তাঁরা ছাড়া এই আলাপচারিতার (কলোকিয়াম) আর কেউ সাক্ষী ছিল না। এ-যেন তন্ত্রসাধকদের গোপন সাধনচক্রের মতো। নিঠুর-দরদী উৎপলকুমার বসুর কর্তৃত্বে ও পার্বতী মুখোপাধ্যায়ের নিখুঁত গৃহিনীপনায় ফার-এর এই সেমিনার ছিল এমন এক অভিজ্ঞতা যা শুধু তাঁরাই জানলেন, যাঁরা এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার কোনও রিপোর্ট কাগজে বেরোয়নি। শুধু 'যোগসূত্র' পত্রিকাকে ডাকা হয়েছিল। এঁরা সেমিনারের আদ্যোপান্ত অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে টেপে রেকর্ড করেন। এই অভিনব কর্মশালার ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিকগুলি আজ এই পত্রিকা বিশদভাবে উপস্থিত করছে।

২

কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল : বিমূর্ততা ও বিমূর্তনের প্রক্রিয়া। গণিত, পদার্থবিদ্যা, সমাজ-বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে বেশ ক'জন জানে-মানে বিশেষজ্ঞ বিষয়টির ওপর নিজ নিজ অনুসন্ধানের আলোকপাত করেন। প্রায় সকলেই বিষয়টিকে দেখতে চান পোস্ট-মডার্ন বা উত্তর-আধুনিক অবস্থান থেকে।

উত্তর-আধুনিকতা বা পোস্ট-মডার্নিস্ট বিচারধারার আলোয় 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এর মানস রায়ের ভূমিকা এই আলোচনাচক্রে ছিল প্রধান পুরোহিতের মতন। পরিশীলিত, শ্মশ্রুময়, আয়তচক্ষু ও রূপবান এই তরুণ অধ্যাপক মূলত বক্তব্য রাখেন বিমূর্তনের প্রক্রিয়া নিয়ে। তাঁর লিখিত বর্ণনা ও কাগজপত্র সরিয়ে রেখে সুদীর্ঘ মৌখিক ব্যাখ্যানগুলি ছিল নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে সরে যাবার মতন। অন্তত, আমার অনেকটা সে-রকমই মনে হয়েছিল। প্রায় মাস-আটেক আগের কথা। তাঁর বক্তব্য আমি যা বুঝেছিলাম তার স্মৃতি এইরকম :

উত্তর-আধুনিকতার যে শিক্ষায়তনিক চর্চা, তাঁর মতে, তা প্রকৃত ঐতিহাসিক সমাজ-চর্চা থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখছে। টালিগঞ্জে স্তূপাকার জঞ্জালের একটি পেপার-কাটিং দেখিয়ে সংবাদপত্রের একটি রিপোর্ট পড়ে শোনালেন। জানা গেল, আসলে এখানে ছিল একটি মস্ত পুকুর। এটিকে সুইমিং-পুল করার জন্য মালিক পুরসভাকে দান করেন। কালক্রমে পুকুরটি বোজানো হয়েছে জঞ্জাল দিয়ে। এখন বহুতল আবাসন হবে। মালিক ভদ্রলোক শর্তভঙ্গের কারণে মামলা করেছেন।

বিদেশী পত্রিকায় হোমি ভাবার মতো (পরমাণু বিজ্ঞানী নন, বলাই বাহুল্য) প্রাতিষ্ঠানিক তাত্ত্বিক, মানসবাবু জানালেন, এটাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন পরিচ্ছন্ন প্রথম বিশ্বের বিরুদ্ধে নোংরা তৃতীয় দুনিয়ার অভিমানী প্রতিবাদ হিসেবে। অর্থাৎ, ঐ দুর্গন্ধমাদনকে। আর এটাই হয়ে দাঁড়াল এক মূল্যবান পোস্ট-মডার্নিস্ট গবেষণার বিষয়! আন্তর্জাতিক সেমিনার হল, বিস্তর আলোচনা ও পেপার বেরুল এসব নিয়ে। উনি ঐ হোমি ভাবার জঞ্জাল-তত্ত্ব থেকে বেশ কিছুটা পড়েও শোনালেন। সে কী দুর্জ্ঞেয় ভাষা রে বাবা! ব্রহ্মজ্ঞদের একদম ছোটভাই। দাঁত ফোটাবে কার সাধ্য। বিশেষত আমরা যারা সাব-অলটার্ন— আমাদের তো দুধে-দাঁত। পাশে বসা পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট বন্ধুকে অত্যন্ত অচেনা-অচেনা লাগল বা এই প্রথম শব্দই মনে হল যখন 'কিন্তু এইসব শব্দ— এদের কি ডিকশনারিতে পাব?'— জানতে চাওয়ায় ধ্যান-ভঙ্গের বিরক্তি থেকে তিনি জানালেন, 'চুপ করুন, এ-জন্যে আলাদা ডিকশনারি আছে!' বুঝলাম, এ কিছু অক্সফোর্ড কনসাইজের কর্ম নয়'— যা আমার আছে।

রাতের দিকে ছাদে বসেছিলাম সবাই। আকাশ নক্ষত্রখচিত। কিন্তু দূরে-কাছে মাদল-শব্দ নেই। বরং ক্ষেতে-খামারে কোথাও এত রাতে একটা জলের পাম্প চলছে। আকাশে এখন দৃশ্য বলতে একটি অন্ধকার জলের ট্যাঙ্ক।

মানসবাবুর কাছে জানতে চাইলাম, টালিগঞ্জের জঞ্জাল পড়ে থাকবে টালিগঞ্জে, আর তাই নিয়ে সাধনা চলবে উত্তর-আধুনিকতার তারাপীঠ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণা করে যাবেন তৃতীয় দুনিয়ার প্রথম বিশ্বস্থ নাগরিক, ডক্টরেটও পাবেন, এতো ভারি মজার ব্যাপার! উনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ওঁরা হয়তো এ-রকম কৌতূহলকে উপেক্ষা করবেন ক্ল্যারিটি ফেটিশিজম বলে। ক্ল্যারিটি? ফেটিশিজম? এরও বঙ্গানুবাদ হয়। তবে সে বড় রকের ভাষা। আপাতত, ধরা যাক, মানে হল, ব্যাখ্যা-ক্যাংলা। সত্যিই তাই। আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের অবমানব (সাব-অলটার্ন) আমাদের তো কোনও নিজের ভাষাই নেই। আমাদের ভাষা হল প্রভুর ভাষা, যা আমরা বলি। আর, 'আমাদের ভাষার' উৎস-সন্ধানেই তো এঁরা— এই হোমি ভাবা ও তাঁর সাহেব সতীর্থরা যা খুঁজে বের করছেন, শিকাগোর ইউনিভার্সিটিতে। আমাদের ভাষা যোগাতে প্রাণান্তিপাত করছেন। তাই আপাতত আমাদের ধৈর্য হারা যাবতীয় জিজ্ঞাসার পোস্ট-মডার্নিস্ট উত্তর একটাই: চোপ শালা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক মিহির চক্রবর্তী পঠিত ও বক্তব্য বিষয় ছিল: গণিত ও আকাশকুসুমতা। আকাশ? কুসুমতা? 'আপনাদের ভাষায় হয় না বুঝি?' স্মিতচক্ষু নাবিকের হাসি হেসে মিহির জানালেন, 'হয়-না, হতে-পারে-না এমন কনসেপ্ট কিন্তু গণিতে নেই। এখানে এগিয়ে যাবার পথ একটাই। যেখান দিয়ে যাব সেটাই পথ আর কী।' 'রাজপথও বলতে পারেন'— উনি আরও বললেন। সবাই সহাস্যে সমর্থন করেন ওঁকে। উনি প্রথমেই বলে নেন, আসলে আমি কোনও থিসিস পড়ছি না। গণিত আর বিমূর্ততা নিয়ে কতকগুলো সাবটাইটেল কী হতে

পারে, তাই আপনাদের জানাচ্ছি। উনি এক-একটি উপ-শিরোনাম জানিয়ে সে-সম্পর্কে খানিকটা করে বলেন। প্রকাশ কর্মকার মাঝে মাঝেই মন্তব্য করছিলেন, 'আরে, আমার ক্যানভাস নিয়েও তো একই সমস্যা।' সে এক অশ্রুতপূর্ব বক্তৃতা ছিল মিহিরবাবুর, সত্যিই। যাদুকর যেন, যন্ত্র তন্ত্র থেকে কত পাখি যে এসে বসছে তার সর্বাঙ্গে!

জীবনানন্দের একটি কবিতার কথা আমারও ধূসরভাবে মনে আসছিল তখন— যেখানে জাফরান-রঙা সূর্যের নরম শরীরে থাবা বুলিয়ে খেলা করছিল একটি বিড়াল। তারপর তার ভিতরের অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো লুফে আনছিল সে। সারা পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিচ্ছিল। মিহির যেন ঠিক তাই করছিলেন।

তিনদিনব্যাপী এই সেমিনারে অংশ নেন 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এর প্রদীপ বসু। মূলত উত্তর আধুনিক বা উত্তর সংগঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজবিদ্যা, জাতীয়তাবাদ, চিত্রশিল্প, চলচ্চিত্রে বিমূর্ততাসহ নানান বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে প্রতিদিন। দিন গড়িয়ে যায় রাতে। নবীনানন্দ সেন, অনিরুদ্ধ লাহিড়ী, মনীসজ মজুমদার, শিবাজীপ্রতিম বসু, প্রকাশ কর্মকার, কালীকৃষ্ণ গুহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন। যতদূর মনে পড়ছে, শিবাজীপ্রতিমের অন্যতম বক্তব্য ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের গরীবরা অংশগ্রহণ করেনি। গরীবের বিমূর্ততাকে ঐ ইতিহাসে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। অনিরুদ্ধ শুরু করেছিলেন, 'বিমূর্ত ছবি থেকে অবজেক্ট নির্বাসিত।' এই বলে। বিমূর্ত শিল্পী বাঁধন দাস বললেন, বুদ্ধিজীবীরা যে-ভাবেই বলুন, আঁকতে গিয়ে বুঝি বিমূর্ততা থেকে বস্তুর মৃত্যু হয়নি। থিয়োরিটিক্যালি তারা আছে।

আবোল-তাবোল রাগিনীতে প্রকাশ কর্মকারের গলা-সাধা (বক্তব্য রাখা) সেদিন সুকুমার রায় পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। বিজন চৌধুরী দেখালেন, তিনি সশরীরে স্বয়ং এক সবাক বিমূর্ততা!

পরিশিষ্ট

শেষদিন বিভূতিভবনে অনেক রাত পর্যন্ত ভূতের গল্প। ফেরার পথে দেখলাম নির্জন পথ দিয়ে একটি গরুর গাড়ি এগিয়ে আসছে। গাড়োয়ান নেই। ভয়ই পেয়েছিলাম। গাড়িটি এগিয়ে যেতে দেখি, ছইয়ের মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় গাড়োয়ান একজন শায়িতা নারীর দিকে ঝুঁকে কথা বলছে। পাশে শুয়ে ঘুমন্ত শিশু।

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে গরুর গাড়িটি ফুলডুংরির দিকে এগিয়ে চলছে। দেখলাম, এত রাতে চন্দ্রাস্ত হচ্ছে পথ জুড়ে।

বাঁধন বলেছিল, সমস্ত বিমূর্ততার মধ্যেই বস্তু থেকে যায়। তাই, সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম চাঁদ তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। □